রক্তের ঋণ

সুব্রত রায়

এলিজাবেথ ডরোথি ওয়াটসন ওরফে লিজা ওয়াটসন নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। কোটের হাতা সরিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকালো। ট্রেন রিজেন্ট পার্ক টিউব স্টেশনে ঢুকছে। তাকে এবার নামতে হবে।

ফেব্রুয়ারি মাস। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। তাপমাত্রা শূন্যের কাছাকাছি। জোরে হাওয়া বইছে। লিজা ভালো করে কান ঢেকে নিলো। মিনিট দশেক হাঁটলে তার অফিস - লন্ডনে বিবিসির সদর দফতর।

লিজা কার্ড দিয়ে দরজা খুললো। দোতালার করিডোরের শেষ প্রান্তে তার বসবার জায়গা। বাইরের ঠাণ্ডার চিহ্ন অফিসের মধ্যে নেই। লিজা ওভারকোট খুলে ব্রাকেটে ঝুলিয়ে রাখলো। হ্যান্ডব্যাগ থেকে চিরুনি বার করে চুল আঁচড়ে নিলো।

অফিসে এসে প্রথম কাজ ইমেল দেখা। প্রায় প্রতিদিনই তিরিশ চল্লিশটা ইমেল আসে। তার মধ্যে অন্তত দশ পনেরোটা স্প্যাম। সেগুলি দেখবার দরকার হয় না। সবচেয়ে শেষে আসা ইমেলের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো। মিস্টার পার্কারের মেল। পার্কার লিজার চেয়ে অন্তত পাঁচ ধাপ উপরে কাজ করেন। বিবিসির একজন মাথা। গত আট বছরে এত উঁচুতলার বসের কাছ থেকে কখনও লিজা ইমেল পায় নি। তবে কি কাল থেকে আসতে হবে না? লিজা ভাবতে লাগলো। লিজা ভয়ে ভয়ে মাউস পয়েন্টারটা মেলের উপর আনলো। ক্লিক করে মেলটা খুললো। লিজা, তোমার হাত খালি থাকলে তুমি কি আমার ঘরে আসতে পারবে? জিম। লিজা গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলো। জিম পার্কার তাকে ডাকবে কেন? ব্যাঙ্কে কতো পাউন্ড আছে? চাকরি না থাকলে ক-দিন চালাতে পারবে? এইসব ভাবতে ভাবতে ফোন তুলে ঠাণ্ডা গলায় বললো - জিম আমি কি এখন আসতে পারি? এসো - জিম বললো।

লিজা দরজায় টোকা দিয়ে মিস্টার পার্কারের ঘরে ঢুকলো।
- সুপ্রভাত লিজা।
- সুপ্রভাত জিম।
মিস্টার পার্কার তার সামনের চেয়ারে বসবার জন্য ইঙ্গিত করলেন। পার্কার বলতে সুরু করলেন - তোমাকে একটা বিশেষ কাজের দায়িত্ব বিবিসি দিতে চায়। কাজটা প্রচুর পরিশ্রমের এবং তার জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে। পার্কার লিজার চোখের দিকে তাকিয়ে একটু থামলেন। অভ্যাসবশত লিজা ইতিমধ্যে রাইটিং প্যাডটা নিয়ে বলপয়েন্ট কলমটা খুলে লেখার জন্য তৈরি। পার্কার আবার বলতে শুরু করলেন - না না তোমায় এখন কিছু লিখতে হবে না।

সামনের বছর ইন্ডিয়ার একটি অঙ্গরাজ্য ওয়েস্ট বেঙ্গলে নির্বাচন হবে। মনে হয় মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে। গত চৌত্রিশ বছর ধরে কম্যুনিস্টরা এখানে রাজত্ব করে আসছে। আমরা তোমাকে কলকাতা ও তার আশেপাশের নির্বাচন কভার করার জন্য পাঠাতে চাই। হাতে এখনও একবছর সময় আছে। তোমার কি মনে হয়? আমার আপত্তি নেই - লিজা বললো। পার্কার বললেন - তাহলে এই ফাইলটা নিয়ে যাও। এর মধ্যে আমাদের পুরো পরিকল্পনাটা আছে। তুমি এটা ভালো করে পড়। পড়ার পর যদি তোমার এ-কাজের দায়িত্ব নিতে আপত্তি না থাকে তাহলে আজ বিকেলে আমাকে ফোন করে বা ইমেল করে জানিও। ফাইলের শেষে তুমি দেখতে পাবে কেন এত লোকের মধ্যে তোমাকে নির্বাচন করা হলো। সাধারণভাবে এটা গোপনীয়। কিন্তু আমি মনে করেছি এটা জানা থাকলে তোমার কাজের পক্ষে সুবিধা হবে। কাল দুপুর তিনটার সময় একটা মিটিং ডাকা আছে। সেই সময় তুমি এখানে চলে এসো। গুড ডে।

লিজা ফাইলটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো - ধন্যবাদ। পার্কার নিজের চেয়ার থেকে উঠে হাতল ধরে দরজাটা খুললেন আর বললেন - তোমার সাফল্য কামনা করি।

লিজা ধীর পায়ে করিডর পার হয়ে নিজের ঘরে ঢুকলো। গতকাল যে লেখাটা শুরু করেছিলো সেটা শেষ করলো। লেখাটা ইমেলে ডেস্কে পাঠিয়ে দিয়ে ফাইলটা খুলে বসলো। ফাইলে পঁয়ত্রিশটা এ-ফোর সাইজের কাগজ আছে। লিজা প্রথম পাতাটা খুলে দেখলো তাকে ঠিক কি কাজ করতে হবে এক পাতার মধ্যে লেখা আছে। লেখা আছে বাংলা ভাষা শিখতে হবে। পাতার শেষ দিকে গিয়ে লিজা হেসে ফেললো। শাড়ি পরে চলাফেরা করা অভ্যাস করতে হবে। বয়েজ কাট চুল চলবে না। এক বছর চুল কাটতে পারবে না। লিজা এবার শেষ পাতায় গেলো যেখানে তার নির্বাচনের কারণগুলি লেখা আছে। বয়স একত্রিশ বছর। শেষ ডাক্তারি পরীক্ষায় দেখা গেছে সম্পূর্ণ সুস্থ। অবিবাহিত। এল-এস-ই তে পড়েছে। লেখাপড়ায় ভালো। মাতৃভাষা ইংরাজি, কিন্তু ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষায় সমান দক্ষ। সুতরাং বাংলা শেখা কঠিন হবে না। পুরুষ ও মহিলা উভয়ের কাছে পৌঁছতে গেলে একজন মহিলার প্রয়োজন। ইংরেজ হলেও চেহারার মধ্যে একটা বাঙালি সুলভ কমনীয়তা আছে। ব্রিটেনের নির্বাচন কভার করার অভিজ্ঞতা আছে এবং ডেসপ্যাচ গুলির মধ্যে তার নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশ পেয়েছে। গান জানে। পিয়ানো ও কি-বোর্ড ভালো বাজাতে পারে। সহজে বাংলা গান শিখে নিতে পারবে। কম্পুটার ব্যবহারের খুঁটিনাটি জানে। কোনো ভারতীয়কে এ-কাজ দিলে নিরপেক্ষ মতামত পাওয়া হয়তো যাবে না। তাছাড়া একজন ইংরেজ মহিলা যে বাংলায় কথা বলতে পারে, স্থানীয় লোকদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হবে।

লিজা মন দিয়ে ফাইলটা দু-বার পড়লো। অপরিচিত পরিবেশ, নতুন ধরণের কাজ। অনেক অভিজ্ঞতা হবে। বিকেলের আগেই পার্কারকে জানিয়ে দিলো - আমি রাজি। কাল বিকেল তিনটার সময় আপনার ঘরে যাবো।

* * * * * * *

ঘরে ঢুকে লিজা দেখলো পার্কার ছাড়া আরও দু-জন বিবিসির বড় কর্তা, জন ডেক্সটার আর পিটার হবস্ ও এক ভদ্রমহিলা বসে আছেন। পার্কার বললেন - লিজা তুমি তো জন আর পিটারকে চেনো। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি ডক্টর লিপিকা সেনের। মিসেস সেন বিবিসির বাংলা বিভাগে কুড়ি বছর কাজ করছেন আর এদেশে আছেন পঁচিশ বছরেরও বেশি। মিসেস সেনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তোমাকে বারো মাসের মধ্যে বাঙালী মেয়েতে পরিণত করা। মিসেস সেন একটু হেসে বললেন - আমার একটি সাতাশ বছরের মেয়ে আছে। লিজা না হয় আমার বড় মেয়ে হবে। মিস্টার হবস্ জানতে চাইলেন - তোমার কিছু প্রশ্ন আছে? লিজা বললে - এই মুহূর্তে নেই। মিস্টার ডেক্সটার বললেন - তাহলে আজ থেকেই কাজ সুরু করে দাও। আমাদের পরামর্শ বা সাহায্য দরকার হলে আমাদের ইমেল করতে পারো অথবা ঘরে চলে এসো। বেস্ট অফ লাক।

ঘর থেকে বের হয়ে মিসেস সেন বললেন - চলো, তোমার ঘরটা দেখে যাই। ফাইলে বেশ কিছু বই-এর নাম পাবে। এর মধ্যে যেগুলি এখানে জোগাড় করা গেছে, সেগুলি আজই তোমার টেবিলে পৌঁছে যাবে। বাকিগুলি কয়েক দিনের মধ্যে পেয়ে যাবে। তাছাড়া ইন্টারনেট আছে। তোমার কোনো বই এর দরকার হলে আনিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। এই ফর্মটা ভর্তি করে দাও। সামনের সপ্তাহ থেকে বাংলা শেখার ক্লাস সুরু হবে। সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা। বাড়িতে তুমি যতগুলি পারো ভারতীয় ইংরাজি আর বাংলা চ্যানেল দেখার ব্যবস্থা করে নাও। খেয়াল রেখো, ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের এখন সময় পার্থক্য সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা। কাল থেকে দু-সপ্তাহ তোমার স্টিল ও ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার ট্রেনিং হবে। যদিও তোমার সঙ্গে ক্যামেরাম্যান থাকবে, তবুও এই ট্রেনিং এর প্রয়োজন আছে। কলকাতায় স্টিল ছবি তুমি নিজে তুলবে। সাতদিন স্টুডিয়োতে আর সাতদিন আউটডোর ট্রেনিং হবে। তুমি আজ মিস্টার জ্যাকসনের সঙ্গে কথা বলে নিয়ো। বাঙ্গালীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজার কয়েকদিন আগে, মানে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে তিন সপ্তাহের জন্য তোমায় কলকাতায় যেতে হবে। ততদিনে তুমি বাংলা শিখে যাবে। তোমাকে যে ফাইল দেওয়া হয়েছে নিশ্চয়ই দেখেছো।

* * * * * * *

- লিপিকা?
- লিজা! কবে ফিরলে?
- গতকাল বিকেলে এসেছি।
- কেমন হলো তোমার কলকাতা সফর?
- খুব ভালো। বিভিন্ন পেশার প্রায় একশ পঞ্চাশ জনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। কলকাতার এ-মাথা ও-মাথা অনেকবার চষে ফেলেছি। মোটামুটি কলকাতার রাস্তাঘাট চেনা হয়ে গেছে।

অষ্টমী পুজোর দিন সারারাত গাড়ি করে কলকাতায় ঘুরেছি। এক হাজারের এর বেশি ছবি তুলেছি। তার থেকে বেছে আপনাকে দেখাব।

- শনিবার রাতে জিম, পিটার আর জনকে আমার বাড়িতে ডিনার খাবার জন্য নেমন্তন্ন করেছি। বাঙ্গালী খাবার খাওয়াব। তোমার যদি অসুবিধা না থাকে তাহলে আমার বাড়িতে সকালেই চলে এসো। হাতে হাতে আমার সঙ্গে কাজ করতে হবে।

- আমার কোনো অসুবিধা নেই। সকালেই চলে যাবো। কলকাতা থেকে অনেক বই আর বাংলা সিনেমার ডিভিডি এনেছি। যে কটা পারি নিয়ে যাবো।

- আমি মিস্টার সেনকে বলবো তোমাকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে। বইগুলি সব নিয়ে এসো। রাতে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবো।

- মিস্টার সেন কেন আবার কষ্ট করবেন?

- কষ্ট আর কি? বই নিয়ে বাস আর টিউবে আসতে তোমার অসুবিধা হবে। মিস্টার সেন গাড়ি চালাতে ভালোবাসেন। ওর কোনো অসুবিধা হবে না।

- আমি কলকাতা সফরের একটা রিপোর্ট লিখছি। তার একটা কপি আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

* * * * * * *

আমার কিন্তু একটু ভয় করছে - পার্কার বললেন। পার্কারের মুখে কপট ভয়ের ছাপ ফুটে উঠলো। আসা অবধি দেখছি লিজা আর মিসেস সেন বাংলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। ধরে নিতে পারি আমাদের মুণ্ডপাত করছে না - পার্কার বললেন। জন ডেক্সটার জানতে চাইলেন - তাতে ভয়ের কি হলো? আরে বুঝতে পারছো না। লিজা বাংলা শিখে ফেলেছে। কলকাতায় গিয়ে কত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। মিসেস সেনকে বাঙালী রান্নায় সাহায্য করছে। এর পর হঠাৎ যদি একটা বাঙালী ছেলেকে হুট করে বিয়ে করে কলকাতায় থেকে যায় তাহলে আমাদের প্রোজেক্ট-এর কি হবে? নতুন করে লোক তৈরি করার আর সময় নেই। আমাদের মাথার উপর যে বুড়োটা বসে আছে সে আমাদের তিনজনের চাকরি খাবে - পার্কার বললেন। মিসেস সেন বললেন - শুনুন, আমাদের দেশে এতো চট করে বিয়ে হয় না। বেশিরভাগ বিয়ে ছেলে মেয়ের মা-বাবারা ঠিক করেন। পার্কার বললেন - সেটা আবার কি রকম? ছেলে মেয়ের নিজস্ব কোনও মতামত নেই? মিসেস সেন বললেন - আজকাল একেবারে নেই তা নয়। অনেক সময় ছেলে মেয়েরা নিজেরাই বিয়ে ঠিক করে, এ-দেশের মতো। তবে আমাদের সময়টা ছিল অন্য রকম। মিস্টার সেনের দিকে তাকিয়ে লিপিকা বললেন - আমি বিয়ের দিন প্রথম মিস্টার সেনকে দেখি। এর আগে আমাদের মা-বাবারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চালিয়ে ছিলেন। দাঁড়ান, আপনাদের একটা ছবি দেখাই। মিসেস সেন ভিতরের ঘর থেকে একটা বড় খাম নিয়ে এলেন। খামের মধ্য থেকে একটা বড় ছবি বার করে পার্কারের হাতে দিয়ে বললেন - এই সেই মুহূর্ত যখন আমরা পরস্পরকে প্রথমবার দেখলাম। একে বলে শুভদৃষ্টি। এই ছবিটা দেখুন। মিস্টার সেন নিজের গলার মালাটা দু-হাত দিয়ে ধরেছেন। এটা আমার গলায় পরিয়ে দেবেন। পরের ছবিটা দেখুন। ওর গলায় আমি আমার মালাটা পরিয়ে দিচ্ছি। এবার এই ছবিটা দেখুন। আমাদের শাস্ত্রে বলে, সাত-পা

একসঙ্গে হাঁটলে বন্ধুত্ব হয়। বিয়ের সময় তাই দুজনকে একসঙ্গে একটা অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে সাতবার প্রদক্ষিণ করতে হয়। বিয়ের সময় অনেক শপথ নিতে হয় - আগুনকে সাক্ষী করে। সারা জীবনের জন্য অঙ্গীকার। সমস্ত মন্ত্রগুলি সংস্কৃত ভাষায়। অর্থাৎ বহু শতাব্দী ধরে এই প্রথা চলে আসছে। যেমন একটা মন্ত্র:

যদিদং হৃদয়ং মম ।
তদস্তু হৃদয়ং তব ।।

আমার হৃদয় তোমার হোক, তোমার হৃদয় আমার হোক। লিজাকে শুধু বাংলা ভাষা শিখলে চলবে না, বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গেও পরিচিত হতে হবে। মিস্টার ডেক্সটার বললেন - আমি আপনার সঙ্গে একেবারে একমত। মিস্টার হবস্ যোগ করলেন - এ ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই। মিসেস সেন বলতে সুরু করলেন - ইংরেজদের মত বাঙালীরা বড়দের নাম ধরে কখনও ডাকে না। এই যে লিজা আমাকে লিপিকা বলে ডাকে, এটা কোনও বাঙালী করবে না। মিস্টার ডেক্সটার বললেন - তাহলে কি ভাবে ডাকবে? মিসেস সেন লিজার দিকে একবার তাকিয়ে সুরু করলেন - বাংলায় তিন ভাবে একজনের সঙ্গে কথা বলা যায়। আপনি, তুমি আর তুই। এটা ইংরাজিতে নেই। ইংরাজিতে শুধু ইউ। জার্মান ভাষা Sie ও Du বাংলার আপনি আর তুমির মতন। তুই জার্মান ভাষায় নেই। শুনেছি ফরাসি ও ইটালিয়ান ভাষায় আপনি তুমি আছে। বাংলায় অপরিচিত এবং বড়দের সাধারণত আপনি বলা হয়। তবে ঘনিষ্ঠ বড়দের তুমি বলা যেতে পারে। বাবা-মাকে সবাই তুমি বলে। সাধারণত বড়রা ছোটদের অথবা বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে তুই বলে থাকে। ভাই বোনরা নিজেদের মধ্যে তুমি বা তুই ব্যবহার করে থাকে। জিম পার্কার বললেন - ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে। মিসেস সেন বললেন - লিজা বড় ছোট সকলকে আপনি বলতে পারে। তাতে কোনও অসুবিধা নেই। এরপর কাউকে ডাকার পদ্ধতি। লিজা মিস্টার পার্কারকে জিম বলে ডাকে। কলকাতায় কোন ছেলে বা মেয়ে তার উপরওয়ালাকে এভাবে ডাকবে না। স্যার অথবা মিস্টার পার্কার ঠিক আছে। তবে ঘনিষ্ঠতা থাকলে মিস্টার পার্কারকে নিজের বড় দাদার মত দেখতে পারে। সেক্ষেত্রে জিম দাদা বা পার্কার দাদা বলা যেতে পারে। আবার বাঙালী নিয়মে স্যার অথবা মিস্টার পার্কার না ডেকে জিম বাবু বা পার্কার বাবু বলতে দোষ নেই। বাঙালীরা যে কোনো বয়সে বড় ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলার সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলে। সেটা নিজের দাদা, দিদি অথবা বয়স অনুসারে বাবা কিম্বা মার ভাই বা বোন। বেশি বয়সী হলে বাবা কিম্বা মার বাবা মার মতন। ডাকটা সেই অনুসারে হবে। যেমন আমার মেয়ে লিজার বয়সী, তাই লিজা আমাকে তার মায়ের বোন হিসাবে ভাবতে পারে। তাই আমাকে নাম ধরে না ডেকে ডাকতে পারে মাসি অথবা লিপিকা মাসি। লিজা একটু দূরে ডিনার টেবিল সাজাচ্ছিলো। সে ওখান থেকে চেঁচিয়ে বললো - এবার থেকে তোমায় লিপিকা মাসি বলে ডাকবো। মিসেস সেন একটু হেসে বললেন - লিজার সঙ্গে যেহেতু আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, তাই ও আমাকে তুমি বলতে পারে। তবে তুই কখনও নয়। তবে ইচ্ছা করলে আমি লিজাকে তুই বলতে পারি, কারণ ও আমার থেকে অনেক ছোট। আমি আমার মেয়েকে তুই বলি। জিম পার্কার বললেন - লিজাকে তাহলে ইন্টারভিউ করার সময়

এসব খেয়াল রাখতে হবে। মিসেস সেন বললেন - এখানেই শেষ নয়। কিছু সম্পর্ক তৈরি হয় বিয়ে হওয়ার জন্য। যেমন দাদার বউ বৌদি। বিয়ে না হলে কোনো মেয়ে বৌদি হতে পারবে না। লিজা যদি জিমকে জিম দাদা বলে ডাকে, তাহলে মার্গারেটকে বৌদি বলে ডাকতে পারে। হবস্ বললেন - এটা বেশ গোলমালে। কোন মেয়ে বিবাহিত আর কে বিবাহিত নয় বুঝবো কেমন করে? মিসেস সেন বললেন - বুঝতে না পারলে মাসি বা দিদি ডাকাটা নিরাপদ। তবে বুঝবার উপায় একেবারে যে নেই তা নয়। আমার সিঁথির দিকে তাকিয়ে দেখুন। হালকা লাল রঙ দেখতে পাচ্ছেন? এটাকে সিঁদুর বলে। এটা বিবাহিত মহিলার চিহ্ন। অবশ্য সব বিবাহিত মহিলা যে সিঁদুর ব্যবহার করেন তা নয়। তবে কোনও অবিবাহিত মহিলা সিঁথিতে সিঁদুর লাগাবে না। মিস্টার ডেক্সটার বললেন - মেয়েদের ব্যাপারটা না হয় বুঝলাম। কিন্তু কোনো অপরিচিত ছেলে বিবাহিত কিনা কি করে বুঝবো? মিস্টার সেন এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। এবার তিনি মুখ খুললেন। বললেন - একটা শক্ত প্রশ্ন করেছেন। না, বুঝবার কোনও উপায় নেই। তবে এক বাঙালী লেখক লিখেছিলেন, সকালবেলায় আটটা নাগাদ দাড়ি না কামিয়ে বাজারের থলে হাতে কোনো ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটছেন মানে স্ত্রীর তাড়া খেয়েছেন। তবে আমি লিজাকে বলবো রাজনৈতিক নেতাদের ইন্টারভিউ করার সময় স্যার, ম্যাডাম, ডক্টর, প্রফেসর ইত্যাদি ব্যবহার করতে। মিসেস সেন আবার শুরু করলেন -একটা গল্প শুনুন। মনে হয় এটা বানানো। তবে সত্যি হতে বাধা নেই। গল্প শুরু হওয়ার আগে একটা কথা আপনাদের জানা দরকার, আমাদের সমাজে এখনো লিভ টুগেদারের সামাজিক স্বীকৃতি নেই। এটা তেমন ভালো চোখে দেখা হয় না। গল্পটা এই রকম। একজন ইংরেজ ভদ্রলোক জেনে নিয়েছেন কোনো মহিলার সঙ্গে পরিচিত হবার পর জিজ্ঞাসা করতে হয় তিনি বিবাহিত কিনা, কটি ছেলেমেয়ে ইত্যাদি। তিনি প্রথমে একজন মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি বিবাহিত? মহিলা উত্তর দিলেন, না। পরের প্রশ্ন, আপনার ছেলেমেয়ে কটি। মহিলা কটমট করে তাকালেন। তার মুখ লাল হয়ে উঠলো। ইংরেজ ভদ্রলোক ভাবলেন, প্রশ্নগুলি আগেরটা পরে আর পরেরটা আগে হয়ে গেছে। পরের বার আর এক মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার ছেলেমেয়ে কটি? মহিলা উত্তর দিলেন, দুটি। পরের প্রশ্ন, আপনি কি বিবাহিত?

লিজা খাবার টেবিল থেকে চেঁচিয়ে বললো - আসুন এবার ডিনারে বসা যাক। এগিয়ে এসে মিস্টার পার্কারকে বললো - গত রাতে আমি আমার রিপোর্ট আপনাদের পাঠিয়ে দিয়েছি। সোমবার কোনো এক সময় আপনাদের সুবিধা মত আলোচনায় বসা যাবে।

* * * * * * *

জানুয়ারির এক সকালে হিথরো থেকে দুবাই হয়ে লিজা যখন কলকাতায় পৌঁছলো তখন প্রায় দুপুর হয়ে এসেছে। হোটেলে চেক-ইন করে ল্যাপটপ খুলে নিরাপদে পৌঁছেছি ইমেল করে লিজা একটা ঘুম দিয়ে নিলো। গতবার কলকাতায় যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে একপাতা করে খাতায় লিখে রেখেছিল। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে খাতাটা খুলে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। এবার কি কি কাজ করতে হবে সেটা বিস্তৃত লিখে এনেছে।

প্রধান কাজ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলা আর সাধারণ লোকেদের মতামত জেনে নেওয়া। এল-এস-ইর অধ্যাপক মিলটন কাজটা কি ভাবে করতে হবে তার একটা ছক করে দিয়েছেন। মতামত যেন এক তরফা না হয় এটা নজর রাখতে হবে। ইতিমধ্যে বাংলার রাজনীতি সম্বন্ধে তার পরিষ্কার ধারণা হয়ে গেছে। এবার কলকাতায় লিজার সঙ্গী তিনজন। গাড়ির ড্রাইভার অনাথবন্ধু দাস, ক্যামেরাম্যান বলদেব সিং আর ন্যাভিগেটার সৌমিত্র সাহা।

মাসি, সকাল নটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত চরকির মতো ঘুরছি। রোজ পাঁচ থেকে সাত জনের ইন্টারভিউ নিচ্ছি। তাছাড়া সাধারণ লোকেদের সঙ্গে কথা বলে নির্বাচনের হাওয়া বোঝার চেষ্টা করছি। বাংলা বলতে পারা মেমসাহেবের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে কোনো আসুবিধা হচ্ছে না। তারপর ঘরে বসে রাত বারটা পর্যন্ত কাজ করছি। মাঝে মাঝে ক্লান্ত লাগছে। তবে কাজ করতে ভালো লাগছে। কাল নির্বাচন কমিশনের কর্তাদের ইন্টারভিউ নেব। তোমার দেওয়া ট্রেনিং খুব কাজে লাগছে - লিজা ইমেল করলো মিসেস সেনকে। আধঘণ্টার মধ্যে মিসেস সেন উত্তর দিলেন - তোমার প্রতিবেদনগুলি থেকে দুটো এক ঘণ্টার প্রোগ্রাম বিবিসি টেলিকাস্ট করেছে। তোমার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ সকলের ভালো লেগেছে। আমাদের খুব খাটনি গেছে। এডিট করে কোথাও ভয়েস ওভার কোথাও সাবটাইটেল দিয়ে প্রোগ্রামটা ভালো দাঁড়িয়েছে। লিজা জবাব দিলো - এ যাত্রা আমার কাজ শেষ। সামনের মঙ্গলবার আমি ফিরে যাচ্ছি। আমার কাজের বাইরে কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলির প্রচুর স্টিল আর ভিডিও তুলেছি। বলদেব আমাকে খুব সাহায্য করেছে। ইচ্ছা আছে কলকাতার উপর একটা ডকুমেন্টরি করার।

* * * * * * *

তুমি তো শনিবার কলকাতায় যাচ্ছ। কলকাতার নির্বাচনের আগে সাতদিন পাবে। তোমাকে কয়েকটা কথা বলার জন্য আজ ডেকেছি - জিম পার্কার বললেন। লিজা মিসেস সেনের দিকে একবার তাকিয়ে জিম পার্কারের চোখে চোখ রাখলো। শোনো লিজা - জিম পার্কার শুরু করলেন, তোমাকে কলকাতায় পাঠাবার পর থেকে আমাদের একটা জিনিষ খচ্‌খচ্‌ করছে। তোমার ব্লাড গ্রুপ এবি নেগেটিভ। বাঙালীদের মধ্যে এবি নেগেটিভ খুব কম। কোনো সময়, ভগবান না করুন, রক্তের দরকার হলে অসুবিধা হবে। তাই অযথা ঝুঁকি নেবে না। তুমি গতবার বোমা পড়ার মধ্যে ছবি তুলেছো। পুলিস লাঠি চার্জ করছে তার ছবিও দেখেছি। নির্বাচনের দিনে গোলমাল হওয়া কিছু আশ্চর্যের নয়। তাই খুব সাবধান। বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের বা তোমার সঙ্গীদের জীবন বিপন্ন করবে না। মিসেস সেন বললেন - আমিও বলছি, একদম ঝুঁকি নেবে না। জিম পার্কার আবার শুরু করলেন - বাংলার হোম সেক্রেটারির মেয়ে আমার মেয়ের সঙ্গে ইম্পেরিয়াল কলেজে পড়ে। তার মাধ্যমে গতকাল আমি হোম সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন কলকাতার পুলিস কমিশনার কে বলে দেবেন। তুমি কলকাতায় গিয়ে হোম সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করবে। এই নাও তার মোবাইল নম্বর। তারপর পুলিস কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আর একটা কথা, তোমার

ন্যাভিগেটার সাহা আসলে সিক্যুরিটি সার্ভিসের লোক, এক্স সার্ভিস-ম্যান। এবার তোমার সঙ্গে যখন বের হবে ওর কাছে আর্মস থাকবে। সাহা যদি কোথাও যেতে বারণ করে তাহলে ওর কথা শুনবে। মনে রাখবে তোমাদের টিমের ক্যাপ্টেন সাহা। ওর কথাই শেষ কথা। মিসেস সেন বললেন - ভোট সকাল সাতটা থেকে বিকেল পাঁচটা। সকাল ছটার মধ্যে নিশ্চয়ই বেরিয়ে পড়বে। তখন আমাদের এখানে শেষ রাত হলেও তুমি প্রতি ঘণ্টায় আমাকে ফোন করবে।

* * * * * * *

আমি মিস্টার মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করতে চাই, লিজা ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স এ্যাসোসিয়েশন এর অফিসে এসে বললো। মিস্টার মুখার্জী এখন কলকাতায় নেই। আমি অরুণ মিত্র। আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। লিজা বললো - আমি লিজা ওয়াটসন, বিবিসির রিপোর্টার। আজ সকালে বিদ্যাসাগর সেতুর কাছে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। দিনরাত টিভির এক রিপোর্টারের এবি নেগেটিভ রক্তের প্রয়োজন ছিলো। এস-এস-কে-এম হাসপাতালে একটা হোর্ডিং দেখে আমি সকাল এগারোটা নাগাদ আপনাদের ফোন করি। কেউ ফোন ধরলো না। তখন আমি নিজেই আপনাদের অফিসে চলে এলাম। দেখলাম অফিস বন্ধ। খোঁজ নিয়ে জানলাম আপনাদের অফিস সন্ধ্যাবেলায় খোলে। বড় রাস্তার ওপারে যে মেডিকেল কলেজটা আছে তার ব্লাড ব্যাঙ্কে গেলাম। ওখান থেকে মিস্টার মুখার্জীর নাম জানতে পারলাম। তাই ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে যাই। অরুণ মিত্র বললো - আমাদের সংগঠনে সবাই স্বেচ্ছাসেবী। সকলে কোথাও না কোথাও কাজ করে। তাই আমাদের অফিস সন্ধ্যাবেলায় খোলে। আমাদের একজন কর্মি দিনরাত টিভিতে কাজ করে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দু-জন এবি নেগেটিভ ডোনারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছেলেটি ভালো আছে। তবে আটচল্লিশ ঘণ্টা না গেলে কিছু বলা যাবে না। এস-এস-কে-এম ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে শুনলাম একজন মেমসাহেব মানে ইংরেজ মহিলা এক ইউনিট রক্ত দিয়ে গেছেন। লিজা বললো - হ্যাঁ, আমি এক ইউনিট রক্ত দিয়েছি। আমি আপনার কাছে জানতে চাই নির্বাচন কমিশনের সার্কুলারের ফলে আপনাদের কটা শিবির বাতিল হয়েছে। অরুণ বললো - চারটা। নির্বাচন কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সকলকে আমরা চিঠি দিয়েছি। তার উত্তরও এসে গেছে। অরুণ ফাইল থেকে দুটো চিঠি বার করে লিজাকে দিয়ে বললো - এটা আমাদের চিঠি, এটা তার উত্তর। লিজা চিঠি দুটো মন দিয়ে পড়ে বললো - মোট কতগুলি শিবির এই সময়ে বাতিল হয়েছে? অরুণ বললো - খুব বেশি নয়। তবে খবরের কাগজে সার্কুলারের ভুল ব্যাখ্যা ও তারপর কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ইচ্ছাকৃত ভুল তথ্য দেওয়া রক্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে খুব ক্ষতি করেছে। লিজা দেওয়ালে টাঙানো একটা পোস্টার এর দিকে তাকিয়ে বললো - এই পোস্টারটা খুব সুন্দর। রক্ত দিতে তিনবার লাগে: প্রথমে ভয় লাগে, তারপর একটু ব্যথা লাগে, শেষে ভালো লাগে। এই লাগে কথাটা তিন ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অরুণ বললো - আপনি বাংলা পড়তে পারেন। লিজা বললো - মোটামুটি। অরুণ বললো - আমাদের বাংলা ও ইংরাজিতে অনেক পোস্টার আছে। দেখবেন? হ্যাঁ - লিজা উত্তর দিলো। অরুণ লিজাকে কিছু কাগজপত্র দিয়ে বললো - এগুলি সময় করে পড়ে দেখবেন। লিজা বললো - আমাকে রক্ত দিতে তিনবার লাগে পোস্টার একটা দেবেন? ঘরে টাঙিয়ে রাখবো। অরুণ

জিজ্ঞাসা করলো - আপনি এখন কোথায় আছেন? গ্র্যান্ড হোটেলে - লিজা বললো। অরুণ বললো - আমি কিছু পোস্টার ও কাগজপত্র গুছিয়ে গ্র্যান্ড হোটেলের রিসেপশানে রেখে আসব। আপনি ওখান থেকে নিয়ে নেবেন। লিজা বললো - অনেক ধন্যবাদ।

* * * * * * *

কলকাতার নির্বাচন নির্বিঘ্নে শেষ হলো। কোনো রকম গণ্ডগোল হয়নি। রাত দশটায় হোটেলে ফিরে লিজা বিছানায় গা এলিয়ে দিলো। শরীর আর দিচ্ছে না। ঘুম ভাঙলো তখন সকাল আটটা। দিনরাত টিভি চ্যানেলে দেখলো ওদের রিপোর্টার বিপদমুক্ত। তাকে আজ হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে। লিজা নিজের মনে বললো - যাক একটা প্রাণ বাঁচলো। আজ বাকি কাজগুলি সেরে ফেলতে হবে। কাল দিনরাত টিভির অফিসে গিয়ে রিপোর্টার ছেলেটির খোঁজ নিতে হবে।

* * * * * * *

সকাল দশটার সময় লিজা দিনরাত টিভি চ্যানেলের দরজায় হাজির হলো। রিসেপশনিস্টকে বললো - আমি লিজা ওয়াটসন, বিবিসিতে কাজ করি। মিস্টার মিলন চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। রিসেপশনিস্ট জবাব দিলো - মিস্টার চ্যাটার্জী ছুটিতে আছেন। সামনের সপ্তাহের আগে অফিসে আসার সম্ভাবনা নেই। লিজা বললো - অনুগ্রহ করে যদি মিস্টার চ্যাটার্জীর বাড়ির ঠিকানাটা দেন, তাহলে আমি ওর বাড়ি গিয়ে দেখা করতে পারি। রিসেপশনিস্ট বললো - দুঃখিত, আমি বাড়ির ঠিকানা দিতে পারবো না। বারণ আছে। লিজা বললো - আমি কি আপনাদের সি-ই-ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি? ব্রীফকেস হাতে এক ভদ্রলোক অফিসে ঢুকছিলেন। রিসেপশনিস্ট তার দিকে তাকিয়ে বললো - স্যার, এই ভদ্রমহিলা বিবিসিতে কাজ করেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। দিনরাত টিভির সি-ই-ও কল্যাণ বাসু লিজার দিকে তাকিয়ে বললেন - আমার সঙ্গে আসুন। মিস্টার বাসু ঘরে ঢুকে লিজাকে বসতে বলে বললেন - বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি। লিজা বললো - আমি মিলন চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। মিস্টার বাসু বললেন - আপনি বোধহয় মিলনকে রক্ত দিয়েছিলেন। লিজা ঘাড় নাড়লো। মিস্টার বাসু বললেন - ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে আপনার ঠিকানা নিয়ে গ্র্যান্ড হোটেলে দু-বার লোক পাঠিয়েছিলাম। আপনি তখন ছিলেন না। তারপর এই নির্বাচনের ঝামেলায় আর খোঁজ করা হয় নি। ফোন তুলে বললেন - HR এর দপ্তর থেকে মিলনের বাড়ির ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে যাও তো। লিজার দিকে তাকিয়ে বললেন - ভবানীপুরের পূর্ণ সিনেমার পিছন দিকে মিলন থাকে। আপনি কি চিনে যেতে পারবেন? সঙ্গে একজন লোক দেবো? লিজা ততক্ষণে কলকাতার একটা ম্যাপ বার করে ফেলেছে। সে বলতে সুরু করলো - আমি এখন এখানে আছি। এই তো যতীনদাস পার্ক, আশুতোষ কলেজ, ভবানীপুর পুলিস স্টেশন, তারপর পূর্ণ সিনেমা। তার পাশের রাস্তা দিয়ে আদি গঙ্গায় যাওয়া যায়। আমি কলকাতার বড় রাস্তা প্রায় সব চিনি। মিস্টার বাসু বললেন - আমি পাঁচ বছর বিবিসিতে চাকরি করেছি। আমি আর জিম পার্কার একই দিনে বিবিসিতে জয়েন করি। আমরা এক ঘরে বসতাম। হঠাৎ আমার বাবা মারা যাওয়ায় দেশে ফিরে আসতে হয়। কেমন আছে জিম? ওকে বলবেন বাসু খোঁজ করছিলো।

আমার কার্ডটা রাখুন। দয়া করে জিমকে দিয়ে দেবেন। লিজা বললো - ধন্যবাদ, আমি মিস্টার পার্কারকে আপনার কথা নিশ্চয়ই বলবো। মিস্টার বাসু বললেন - আরে আসল কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছি। সে দিনের ঘটনাটা ঠিক কি হয়েছিলো আমাদের জানা নেই। আপনার হাতে যদি একটু সময় থাকে তবে সেদিনের ঘটনাটা ক্যামেরার সামনে বললে আমরা একটা স্টোরি করতে পারি। লিজা বললো - আমার আপত্তি নেই। তবে ইন্টারভিউটা ইংরাজিতে হলে ভালো হয়। কারণ বাংলা আমার তত ভালো নয়। বাসু বললেন - কোনো অসুবিধা নেই। ফোন তুলে বললেন - দু-নম্বর স্টুডিয়োটা রেডি করো। একটা ইন্টারভিউ রেকর্ড করতে হবে। আমি দশ মিনিটের মধ্যে যাচ্ছি।

লিজা ও বাসু স্টুডিয়োর মধ্যে মুখোমুখি বসলেন। আজ প্রোডিউসার রতন দত্ত একটু নার্ভাস। সি-ই-ও কে কোনোদিন অ্যাঙ্কর হতে দেখেনি। নার্ভাস হলে রতন ঘন ঘন প্যান্টটা কোমরের উপর টেনে তোলবার চেষ্টা করে থাকে। এই ধরণের সাক্ষাৎকারের সময় সাধারণত তিনটে ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। আজ সি-ই-ও নিজেই অ্যাঙ্কর তাই রতন পাঁচটা ক্যামেরার ব্যবস্থা করেছে। রতনের আই-কার্ডটা গলায় উল্টো করে ঝুলছিলো। রতন সেটাকে সোজা করে একবার চোখের সামনে আনলো। দু-নম্বর ক্যামেরার ভিউফাইন্ডার থেকে চোখ সরিয়ে পিছনে ফিরে মল্লিকা ফিসফিস করে সহকারীকে বললো - বসকে দেখে রতনদা নিজের নাম ভুলে গেছেন। বাসু সুরু করলেন:

- মিস ওয়াটসন আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ যে আপৎকালে রক্ত দিয়ে আপনি আমাদের উদীয়মান এক রিপোর্টারের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই সে দিনের ঘটনা।

- আমি সকালবেলায় হোটেলে ঘরে বসে চ্যানেল সার্ফ করছিলাম। হঠাৎ একটা চ্যানেলে দুর্ঘটনার খবর পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি নিয়ে আমি এস-এস-কে-এম হাসপাতালে পৌঁছলাম। তখন সকাল নটা বাজে। এমারজেন্সি গিয়ে শুনলাম আপনাদের এক রিপোর্টার জখম হয়েছেন। তার ব্লাড গ্রুপ এবি নেগেটিভ। ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে এক ব্যাগ রক্ত পাওয়া গেছে। ব্লাড ব্যাঙ্কে আর রক্ত নেই। আমি দৌড়ে ব্লাড ব্যাঙ্কে গেলাম। তারা আমার কোনো কথাই শুনবে না। তারা ভাবলো আমি খবরের খোঁজে এসেছি। তাদের অনেক করে বুঝিয়ে বললাম আমার ব্লাড গ্রুপ এবি নেগেটিভ। আমার কাছ থেকে এক ব্যাগ রক্ত নিতে পারেন।

- তারপর?

- এবার মেডিক্যাল অফিসার এগিয়ে এলেন। জানতে চাইলেন আগে রক্ত দিয়েছি কিনা। আমি বললাম, আমার দেশে আমি নিয়মিত রক্ত দিয়ে থাকি। পঁচিশবার রক্ত দেওয়া হয়ে গেছে। শেষ রক্ত দিয়েছি পাঁচ মাস আগে। মেডিক্যাল অফিসার নিজেই রক্ত নেওয়া সুরু করলেন। জানালেন এখন টেস্ট করার সময় নেই। ঠিকঠাক সব টেস্ট করতে তিন-চার ঘণ্টা সময় লাগবে। অতক্ষণ অপেক্ষা করলে ছেলেটি মারা যাবে। আমি বললাম, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে

পারেন। আমার HIV, VDRL, Hepatitis B সব নেগেটিভ। তারপর কথায় কথায় যেটা বেরিয়ে এলো তাতে আমি চমকে উঠলাম।

- সেটা কি?

- নির্বাচন কমিশন একটা নির্দেশ দিয়েছে যে নির্বাচন বিধি চালু হবার পর থেকে আর রক্তদান শিবির করা যাবে না। আমি বললাম, সার্কুলারটা দেখি। মেডিক্যাল অফিসার আমাকে সার্কুলারটা দিলেন। আমি বললাম, কই সে রকম কিছু তো বলেনি। কমিশন বলেছেন, রক্তদান শিবিরে রাজনৈতিক প্রচার করা যাবে না। রক্তদান শিবির করতে কোনো বাধা নেই।

- আমিও সার্কুলারটা দেখেছি। আপনার সঙ্গে একমত।

- এখানেই শেষ নয়। হোটেলে ফিরে যখন আমার ন্যাভিগেটর সৌমিত্রকে এই কথা বললাম সে একটা খবরের কাগজ দেখালো। একটা বাংলা কাগজ নির্বাচন কমিশনের এই সার্কুলার-এর জন্য রক্তদান শিবির বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ফলাও করে খবরটা ছেপেছে। তার সঙ্গে যোগ দিয়ে কয়েকটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিবৃতি দিয়েছে। একটা সংগঠন দাবি করেছে যে তাদের সত্তরটির বেশি শিবির বাতিল হয়েছে। আমার মনে হয় কাগজে নাম ছাপার জন্য এই রকম বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি এই সব দাবি অসত্য। কিছু শিবির ব্লাড ব্যাঙ্ক এবং শিবির আয়োজকদের নির্বুদ্ধিতায় বাতিল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু যতটা বলা হচ্ছে তা ঠিক নয়।

- আপনি কি আপনাদের দেশে রক্তদান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছেন?

- আমাদের দেশে মানুষ স্বেচ্ছায় নিয়মিত রক্ত দেয়। কোনো আন্দোলনের এখন আর দরকার নেই। আমার বাবা Regional Transfusion Centre এর ডিরেক্টর ছিলেন। আমি ছোটবেলা থেকে বাবার সঙ্গে ব্লাড ব্যাঙ্কে ঘোরাফেরা করতাম। আঠারো বছর হওয়ার পর থেকে নিয়মিত রক্ত দিয়ে আসছি।

- আপনার তাহলে এখানে একটা নতুন অভিজ্ঞতা হলো।

- যদি রাগ না করেন তাহলে একটা কথা বলি। আপনাদের মিডিয়ার লোকেদের মাত্রা জ্ঞানটা বড়ই কম। একবার ভেবে দেখেনা তার একটা লেখাটা সমাজের কতটা ক্ষতি করতে পারে। নির্বাচনের জন্য অনেক লোক প্রচারে ব্যস্ত আছে তাই রক্ত সংগ্রহ কমতে পারে। কিন্তু একটা সার্কুলারের ভুল ব্যাখ্যা করে সেটা কাগজে ফলাও করে লিখে রক্তদান শিবির বন্ধ করে দেওয়াকে আমি সামাজিক অপরাধ বলে মনে করি। সব দেশের মিডিয়া নেগেটিভ খবর ছাপতে বেশি পছন্দ করে। তবে এদেশে একটু বেশি বলে মনে হয়। রিপোর্টারদের আর একটু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কোনো বিষয়ে ভালো করে না জেনে বা না বুঝে লেখা বা বলা একদম উচিত নয়। পৃথিবীর কোনো মানুষই সবজান্তা হতে পারে না।

- মিস ওয়াটসন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

লিজা বললো - আমি ক্যামেরার সামনে বলিনি। এই ভোটের কাজ করতে হবে বলে গত একবছর আমাকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। একটা বিদেশি ভাষা শিখতে হয়েছে। ভারতের ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, সামাজিক অবস্থা বোঝার জন্য কত যে বই পড়েছি

তার ঠিকানা নেই। এমনকি বাংলা গান পর্যন্ত শিখতে হয়েছে। বাসু বললেন - তাই নাকি? আর একবার ঐ চেয়ারে বসুন। একটা বাংলা গান হয়ে যাক। লিজা বললো - সেকি? আমার ইন্টারভিউর মধ্যে গান? সে কেমন হবে? বাসু বললেন - বহু বছর পরে এই প্রোগ্রামটা আমি নিজে করবো। ডিভিডিটা আপনাকে পাঠিয়ে দেবো। তখন দেখবেন। স্ক্রিপ্টটা আমি ভেবে ফেলেছি।

মল্লিকা এক নম্বর ক্যামেরার দিকে এগিয়ে গেল। এক নম্বর ক্যামেরার পিছনে দাঁড়ানো ক্যামেরাম্যান উদিতকে বললো - বস কেমন চোস্ত ইংরাজি বলে দেখলি? চ্যানেলের সব কাজ জানে। দেখে নিস এই প্রোগ্রামের এডিটিং, এ্যানিমেশন সব নিজে করবে। বস নিজে অ্যাঙ্করিং করলে আমাদের দেমাকি টিঙটিঙে অ্যাঙ্কর দুটোর আর করে খেতে হতো না।

* * * * * * *

পূর্ণ সিনেমার পাশের গলি দিয়ে লিজা দশ নম্বর বাড়ির দরজার বাইরের কলিং বেলের উপর আঙুল রেখে চাপ দিলো।

- মিলন চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।
- আমি মিলন।
- আমার নাম লিজা ওয়াটসন। বিবিসিতে কাজ করি।
- আপনি বোধহয় আমাকে রক্ত দিয়েছিলেন? তাই না? আসুন, আসুন। বসুন।

মিলন ভিতরে গিয়ে তার মাকে ডেকে আনলো।

- ইনি আমার মা।
- আমি তো ইংরাজি জানি না। এর সঙ্গে কথা বলবো কি করে?

লিজা নিচু হয়ে মিলনের মাকে প্রণাম করে বললো - তাতে কি হয়েছে? আমি তো বাংলায় কথা বলতে পারি। মিলনের দিকে একবার তাকিয়ে বললো - মাসি, খবরের কাগজে মিলনের বয়স দেখেছি। ও আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট। আমি মিলনকে তুমি করে বলবো। মিলন যেন আমাকে লিজা দিদি বলে। মিলনের মা বললেন - তুমি দুপুরে আমাদের সঙ্গে খেয়ে যাবে? লিজা বললো - আজ আমার হাতে সময় কম। কাল দেশে ফিরে যাচ্ছি। জিনিসপত্র গোছানো একটা বড় কাজ। এখন হোটেলে ফিরে সব পাওনাদারদের টাকা পয়সা মিটিয়ে দিতে হবে। কলেজ স্ট্রিটে কিছু বই এর অর্ডার দেওয়া আছে। সেগুলি নিতে যাব। নিউ মার্কেটে কিছু কেনাকাটা করবো। পরের বার যখন আসব তখন জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে। হাতের ব্যাগটা মিলনকে দিয়ে বললো - এর মধ্যে রসগোল্লা আছে। একটা আমাকে দাও। তুমি একটা খাও। কলকাতার প্রায় সব বড় দোকানের রসগোল্লা আমি খেয়েছি। ইচ্ছা আছে রসগোল্লার উপর বিবিসিতে একটা প্রোগ্রাম করার। লিজা উঠে দাঁড়ালো। পিছনের দেওয়ালে একটা বিবর্ণ ছবি ঝোলানো ছিলো। এতক্ষণ নজরে পড়েনি। লিজা ছবিটার দিকে এগিয়ে গেল। ইনি কে? লিজা জিজ্ঞাসা করলো। মিলনের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো, বললো - এর নাম মহীতোষ চ্যাটার্জী। ইনি আমার গ্রেট গ্রান্ডফাদারের ছোট ভাই। বিংশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে, যখন এর বয়স তেইশ বছর,

ইনি মিস্টার ওয়াটসন নামে মেদিনীপুরের ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে গুলি করে হত্যা করেন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। লিজা তার হ্যান্ডব্যাগ খুলে একটা কার্ড বার করলো, বললো - মিলন, কার্ডের পিছনে আমার ব্যক্তিগত জি-মেলটা লিখে দিলাম। যোগাযোগ রেখো। যদি কখনো লন্ডনে আসো, আমাকে জানিও। আমার মার বাড়িটা খুব বড়। থাকার কোনো অসুবিধা নেই। লন্ডন দেখাবার ভার আমার। আচ্ছা আজ তবে আসি।

মিলন ও লিজা দুজনে বাড়ির বাইরে লিজার গাড়ির কাছে এলো। লিজা গাড়ির দরজার হাতলে হাত দিয়ে কি ভেবে ঘুরে দাঁড়ালো। হাত বাড়িয়ে মিলনের হাতটা ধরে বললো - মিলন, আমার গ্রেট গ্রান্ডফাদারের নাম কার্ল ফেডরিক ওয়াটসন। তিনি মেদিনীপুরের ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

April 2011